মূল্য নির্ধারণ কৌশল
Pricing Strategy

ইউনিট ৫

পণ্য উৎপাদন এখন আর খুব বেশি জটিল কাজ নয়। তার চেয়ে বেশি জটিল কাজ হচ্ছে কতটা কম মূল্যে পণ্যটি ক্রেতার নিকট উপস্থাপন করে বেশি বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। আরো বেশি জটিল কাজ হলো প্রতিযোগিতা মোকাবেলা। কারণ প্রত্যেক ক্রেতাই চায় কম মূল্যে ভালো মানের একটি পণ্য ক্রয় করতে। আবার কতিপয় পণ্যের মূল্য এতটা স্পর্শকাতর যে, তা সামান্য কম বেশি ধার্য করলেই বাজারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়।
প্রকৃতপক্ষে, কোন কিছুর বিনিময়ে যা ধার্য করা হয় তাই মূল্য। বৈধ উপায়ে কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য বিক্রেতাকে অবশ্যই কিছু না কিছু পরিশোধ করতে হয়। বিক্রেতাকে ক্রেতার প্রদত্ত এই অর্থই হলো মূল্য। এ মূল্যকে ঘিরেই মূলত বিপণনের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ আছে। প্রথম পাঠে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ধারণা, মূল্যের সংজ্ঞা ও মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব, দ্বিতীয় পাঠে মূল্য নির্ধারণের কৌশল ও মূল্য কৌশলের ভূমিকা, তৃতীয় পাঠে মূল্য কৌশল নির্ধারণের ধাপ ও মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ, চতুর্থ পাঠে মূল্য নির্ধারণের সাধারণ অ্যাপ্রোচ ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ এবং পঞ্চম ও শেষ পাঠে মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১: পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ধারণা, মূল্যের সংজ্ঞা ও মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব
পাঠ-৫.২: মূল্য নির্ধারণের কৌশল ও মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা ব্যখ্যা করতে পারবেন
পাঠ-৫.৩: মূল্য কৌশল নির্ধারণের ধাপ ও মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ
পাঠ-৫.৪: মূল্য নির্ধারণের সাধারণ অ্যাপ্রোচ ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
পাঠ-৫.৫: মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ।

পাঠ ৫.১ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ধারণা, মূল্যের সংজ্ঞা ও মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব Concept, Definition and Importance of pricing

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যের সংজ্ঞা জানতে পারবেন
- মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন

পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ধারণা
Concept of Product Pricing

কোন পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকে বা বিক্রেতা ঐ পণ্য বা সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ আদায় করে তাকে মূল্য বলা হয়। প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই মূল্য নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কারণ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেও লাভ-লোকসান পরিমাপ করা হয়। মূল্য নির্ধারণ পণ্য বিক্রয়েও প্রভাব ফেলে। কাজেই ছোট বড় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

রহিমা বেগম প্রায় ১০ বছর ধরে নিজের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও নারিকেলের নাড়ু তৈরি করে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বাসা ও মুদি দোকানে সরবরাহ করেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথমে তিনি স্থানীয় পাইকারি বাজার থেকে চালের গুঁড়া, চিনি, তেল, গুড়, নারিকেলসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করেন। অল্পশিক্ষিত হলেও সচেতন রহিমা প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন খরচ পৃথকভাবে হিসাব রাখেন। উৎপাদন খরচের সাথে তিনি পণ্যভেদে ২.০০ থেকে ৩০.০০ টাকা মুনাফা ধার্য করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। যেমন– প্রতিটি চিতই পিঠার উৎপাদন খরচ ৩.০০ টাকার সাথে ২.০০ টাকা মুনাফা ধার্য্য করে ৫.০০ টাকায় বিক্রয় করেন। আবার এক কেজি নাড়ু তৈরিতে ১২০.০০ টাকা খরচের সাথে আরও ৩০.০০ টাকা মুনাফা ধার্য করে ১৫০.০০ টাকায় বিক্রয় করেন। এভাবেই মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে রহিমা জনপ্রিয়তার সাথে তার ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। রহিমার পণ্য মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিটি প্রাচীন পদ্ধতি নামে পরিচিত যা আজও জনপ্রিয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত। তবে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি প্রযোজ্য হয় না। অর্থাৎ পণ্য ও ক্রেতাভেদে মূল্য নির্ধারণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

পণ্য মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রথমে মূল্য সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো পণ্য বা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মানুষ যা পরিশোধ করে তাই মূল্য হিসেবে বিবেচিত। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো পণ্য বা সেবা হতে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ভোক্তা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাই মূল্য। সাধারণত ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়। যেমন–রহিমা পাইকারি বাজার থেকে দরকষাকষির মাধ্যমে দশটি নারিকেল ক্রয় করে তিনশত টাকা পরিশোধ করল। এখানে পণ্য হলো নারিকেল আর মূল্য তিনশত টাকা। অর্থাৎ মূল্য হচ্ছে পণ্য বা সেবার জন্য আদায়কৃত অর্থ।

মূল্যের সংজ্ঞা
Definition of Price

সাধারণ অর্থে কোন কিছুর বিনিময়ে যে অর্থ ধার্য করা হয় তাই মূল্য। অর্থাৎ পণ্য বা সেবা প্রদানের বিনিময়ে একজন বিক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ আদায় করে তাই হলো মূল্য। অন্যভাবে বলা যায়, কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে বা করতে প্রস্তুত থাকে তাই হলো মূল্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একজন ব্যবসায়ী ৫০০ টাকার বিনিময়ে একটি ক্যালকুলেটর তার দোকানের জন্য নিয়ে আসলো। তাহলে ঐ ক্যালকুলেটররের মূল্য হলো ৫০০ টাকা। বাটা সুজ কোম্পানী তার প্রতিটি জুতার গায়ে মূল্য লিখে রাখে।তারা প্রতিটি জুতার গায়ে ৯৯৯.৫০ টাকা, ২৮৫০.৫০

টাকা,৪৫৫০.৫০ টাকা ইত্যাদি লিখে রাখে। এখানে প্রতিটির গায়ে লেখা অর্থই হলো ঐ পণ্যের খুচরা বিক্রয় মূল্য। মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

Philip Kotler & Gary Armstrong এর মতে, "Price is the amount of money charged for a product or service." অর্থাৎ মূল্য হচ্ছে পণ্য বা সেবার জন্য ধার্যকৃত অর্থ।

এ প্রসঙ্গে **Perreault & McCarthy** বলেন, "Price is what is charged for something." অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময়ে যা প্রদান করা হয় তা-ই মূল্য।

উপর্যুক্ত আলোচনায় মূল্যের যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় তা হলো-

- ✓ মূল্য হচ্ছে পণ্য বা সেবা বিনিময়ের একটি পন্থা।
- ✓ মূল্য হলো পণ্য বা সেবার বিনিময়ে ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ।
- ✓ ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়।
- ✓ মূল্য হচ্ছে এক ধরনের ভ্যালু যা একজন ক্রেতা কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করে।
- ✓ সকল ব্যবসায়ী এবং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রদত্ত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, কোম্পানিগুলো ক্রেতা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের যে লক্ষ্যে বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তা কেবল বিক্রয়ের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আবার মূল্য ব্যতীত পণ্য বিক্রয় সম্ভব নয় বিধায় বিক্রয়ের পূর্বেই উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। মূল্যের সংজ্ঞার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, মূল্য হচ্ছে পণ্য বা সেবা গ্রহণ বা ব্যবহারের জন্য বিনিময়কৃত অর্থ।

মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব

Importance of Pricing

বিপণন মিশ্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো মূল্য। পণ্য বিপণনে মূল্যের ভূমিকা ব্যাপক। কারণ মূল্য হলো পণ্য বিনিময়ের একটি উত্তম পন্থা। ইহা বিপণন মিশ্রণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিচে মূল্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. বাজার শেয়ার বৃদ্ধি (Increasing market share): মূল্যের কৌশলগত ভূমিকায় বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করতে মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ কৌশলে কোম্পানিগুলো সাধারণত তাদের পণ্যের নিম্নমূল্য ধার্য্য করে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করতে চায়।

২. ক্রেতার জন্য সংকেত (Signal to the buyer): মূল্যের কৌশলগত ভূমিকার আরেকটি দিক হলো ক্রেতার জন্য সংকেত দেয়া। কারণ পণ্য মূল্য ক্রেতাদের সাথে সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই মূল্যের মাধ্যমে ক্রেতারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অবস্থান বা ব্র্যান্ডের মধ্যে তুলনা করে পণ্য ক্রয় করতে পারে।

৩. প্রতিযোগীতার হাতিয়ার (Instrument of competition): প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিযোগিতা বাজারে অবস্থান গ্রহণকে সহজ করে। কারণ মূল্য দ্বারা খুব সহজেই প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে বাজারের পণ্যের অবস্থান অনুযায়ী পণ্যের দাম বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন পড়ে।

৪. বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (Increasing sales volume): পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কোম্পানিগুলো অনেকসময় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এ জন্য কোম্পানিকে পণ্যের মূল্য কম ধার্য্য করতে হয়। পণ্যের মূল্য কম হলে ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়।

৫. আর্থিক সামথ্য বৃদ্ধি (Improving financial performance): মূল্যের কৌশলগত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ধরনের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার সময় আয় ও ব্যয় উভয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। যা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সার্মথ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬. বিপণন কর্মসূচি বিবেচনা (Consideration of marketing program): বিপণন মিশ্রণের উপাদানগুলো হলো পণ্য, মূল্য, বণ্টন, এবং প্রসার। এই উপাদানের মধ্যে মূল্য ছাড়া অন্য বিষয়গলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মূল্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাজারজাকরণের কর্মসূচি যেমন-বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রচেষ্টা সংগঠিতকরণ বিক্রয় উদ্যেগ ইত্যাদি মূল্যের মাধ্যমে বিবেচনা করলে তা বিক্রয় কৌশলে সরাসরি প্রভাব ফেলে। কাজেই এক্ষেত্রে মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা ব্যাপক।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে কোম্পানিকে টিকে রাখার জন্য মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা অত্যাধিক। কারণ বিপণন কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নে বিপণন মিশ্রণের এ উপাদানটি ব্যাপকভাবে ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

কোন পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকে বা বিক্রেতা ঐ পণ্য বা সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ আদায় করে তাকে মূল্য বলা হয়। প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতষ্ঠিানের জন্যই মূল্য নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কারণ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেও লাভ-লোকসান পরিমাপ করা হয়। মূল্য নির্ধারণ পণ্য বিক্রয়েও প্রভাব ফেলে। কাজেই ছোট বড় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। বৈধ উপায়ে কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য বিক্রেতাকে অবশ্যই কিছু না কিছু পরিশোধ করতে হয়। এ মূল্যকে ঘিরেই মূলত বিপণনের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। কোম্পানিগুলো ক্রেতা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের যে লক্ষ্যে বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তা কেবল বিক্রয়ের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আবার মূল্য ব্যতীত পণ্য বিক্রয় সম্ভব নয় বিধায় বিক্রয়ের পূর্বেই উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক।

পাঠ-৫.২ মূল্য নির্ধারণের কৌশল ও মূল্য কৌশলের ভূমিকা
Pricing Strategy and Strategic Role of Pricing

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্য নির্ধারণের কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূল্য নির্ধারণের কৌশলসমূহ
Price Determination Strategy

বর্তমান পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাজারজাতকারীকে মূল্য নির্ধারণ কৌশল প্রণয়ন করতে হয়। তাই ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় ক্ষমতা, পণ্যের চাহিদা, সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের উপস্থিতি, পণ্য সারি পরিমার্জন ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরণের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, মূল্য কৌশল হলো মূল্য সিদ্ধান্তের সঠিক দিক নির্দেশনা। বিভিন্ন লেখক মূল্য কৌশলের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে **Cravens & Piercy** বলেছেন, "Price strategies are the guidelines and policies used to effectively guide pricing decisions to match target market conditions." অর্থাৎ, মূল্য কৌশল হচ্ছে লক্ষ্য নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার সাথে মূল্য সিদ্ধান্তের কার্যকর সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা।

Xavier Vives বলেছেন, "The concept of pricing strategy is to use price as an element to achive specific marketing goals." অর্থাৎ, মূল্য কৌশলের ধারণাটি সুনির্দিষ্ট বিপণন লক্ষ্য অর্জনের উপাদান যা মূল্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উপরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ কৌশলের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়:

- ✓ মূল্য বির্ধারণ কৌশল মূল্যের দিক নির্দেশনা প্রদান করে
- ✓ পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতির সাথে মূল্যকে খাপ খাওয়ানো যায়
- ✓ ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে মূল্যের সামাঞ্জস্য বিধান করা যায়
- ✓ প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করা সহজ হয়
- ✓ মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে

পরিশেষে বলা যায় যে, মূল্য নির্ধারণ কৌশল হলো পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এর একটি দর্শন।

মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা
Strategic Role of Price

বিপণনে মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা ব্যাপক। কারণ মূল্য হলো বিনিময়ের একটি অন্যতম পন্থা। ইহা বিপণন মিশ্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিচে মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **বাজার শেয়ার বৃদ্ধি (Increasing market share):** পণ্য বা সেবার বাজার শেয়ার বৃদ্ধিতে মূল্য কৌশলকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য থাকে অধিক বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন। এ প্রক্রিয়ায় কোম্পানিগুলো সাধারণত তাদের পণ্যের নিম্ন মূল্য ধার্য্য করে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করতে চায়।

২. **বাজার অবস্থান নির্দেশক (Indicator of market position):** পণ্যের মূল্য একটি কোম্পানির বাজারে অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। বেশি দাম মানে সাধারণত উচ্চমানের পণ্য বা সেবার প্রতীক, আর কম দাম সাধারণত বৃহত্তর ভোক্তা শ্রেণীর জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

৩. **ক্রেতাকে সংকেত প্রদান (Signal to the buyer):** মূল্যের কৌশলগত ভূমিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ক্রেতার জন্য সংকেত দেয়া। কারণ পণ্যের মূল্য ক্রেতাদের সাথে সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই মূল্যের মাধ্যমে ক্রেতারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অবস্থান বা ব্র্যান্ডের মধ্যে তুলনা করে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

৪. **প্রতিযোগীতার হাতিয়ার (Instrument of competition):** বর্তমান যুগে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্য কৌশল প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবস্থান গ্রহণকে সহজতর করে। কারণ মূল্য দ্বারা খুব সহজেই প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে বাজারের পণ্যের অবস্থান অনুযায়ী পণ্যের দাম বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন পড়ে। কোম্পানিগুলো প্রায়ই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কৌশল অনুসরণ করে, যা বাজারে প্রতিযোগীদের ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

৫. **বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (Increasing sales volume):** পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কোম্পানিগুলো অনেক সময় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় কোম্পানি পণ্যের মূল্য কম ধার্য্য করে। পণ্যের মূল্য কম হওয়ায় ক্রেতারা ঐ পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিযোগীতামূলক বাজারে কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার জন্য মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা অত্যাধিক। মূল্য কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলে বাজারে টিকে থাকার কৌশল খুঁজে পায়।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাজারজাতকারীকে মূল্য নির্ধারণ কৌশল প্রণয়ন করতে হয়। তাই ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় ক্ষমতা, পণ্যের চাহিদা, সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের উপস্থিতি, পণ্য সারি পরিমার্জন ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরণের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, মূল্য কৌশল হলো মূল্য সিদ্ধান্তের সঠিক দিক নির্দেশনা। প্রতিযোগীতামূলক বাজারে কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার জন্য মূল্যের কৌশলগত ভূমিকা অত্যাধিক। মূল্য কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে টিকে থাকার কৌশল খুঁজে পায়।

পাঠ-৫.৩ মূল্য কৌশল নির্ধারণের ধাপ ও মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ
Steps in Selecting Price and Objectives of Pricing

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্য কৌশল নির্ধারণের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূল্য কৌশল নির্ধারণের ধাপ বা পদক্ষেপসমূহ
Steps in Selecting Price

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কৌশল একটি জটিল বিষয়। কারণ কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল্য কৌশল অনুসরণ করা হয়। তবে পরিবর্তিত নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ কৌশলে ভিন্নতা দেখা যায়। ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় ক্ষমতা, পণ্যের চাহিদা, সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের উপস্থিতি, পণ্য সারি পরিমার্জন ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরণের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে। তাই মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কতকগুলো স্তর বা ধাপ অনুসরণ করা হয়। নিচের ছকে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

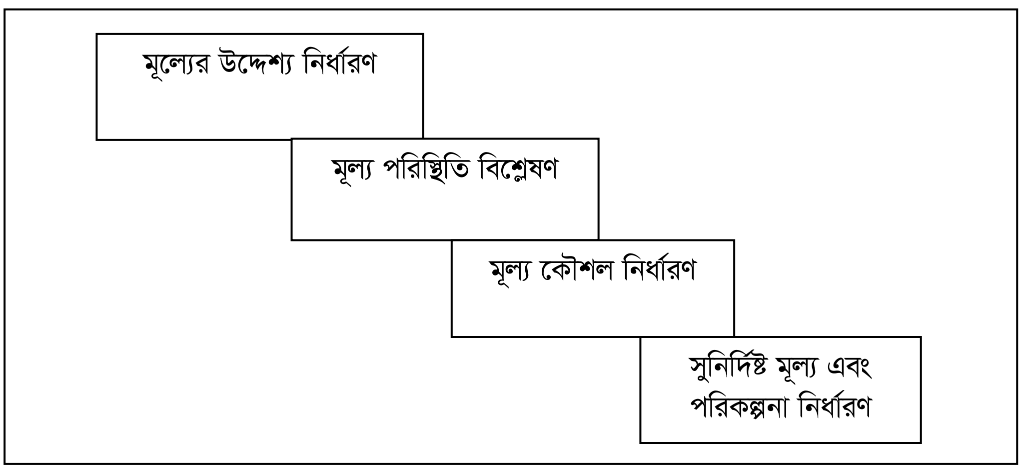

চিত্রঃ মূল্য নির্ধারণের ধাপ

১. **মূল্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Setting pricing objectives):** মূল্য নির্ধারণ কৌশলের প্রথম ধাপ হলো মূল্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। সাধারণত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে মূল্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়:
   - ✓ বাজারে অবস্থান অর্জন
   - ✓ মুনাফার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন
   - ✓ পণ্যের ভাবমূর্তি সম্পর্কে অবহিতকরণ
   - ✓ পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা সচেতনতা সৃষ্টি
   - ✓ পণ্যের অবস্থান গ্রহণ
   - ✓ পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি
   - ✓ প্রতিযোগিতার উপর প্রভাব সৃষ্টি ইত্যাদি।

২. **মূল্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ (Analyze pricing situation):** পণ্যের মূল্য নির্ধারণের এ স্তরে নতুন পণ্যের ধারণা মূল্যায়ন বা নতুন পণ্যের মূল্য কৌশল নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। তেমনি বাজার এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তনশীলতার কারণে চলমান পণ্যের ও নিয়মিত মূল্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। মূল্য পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুরো হলো:

ক) ক্রেতাদের মূল্য সংবেদনশীলতা: ক্রেতারা সর্বদা মূল্য সংবেদনশীল। বিশেষ করে বিকল্প মূল্যের প্রতি ক্রেতাদের সাড়া দানের প্রবণতা মূল্য নির্ধারণ বিশ্লেষণের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মূল্যের প্রতি ক্রেতার সাড়াদানের যথার্থতা বিশ্লেষণে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আবশ্যক হয়:

- ✓ ক্রয় সম্ভাবনার দিক থেকে পণ্য বাজার পরিধি কেমন
- ✓ ব্যবহৃত বাজার বিভাজন ও বাজার টার্গেটিং কৌশল
- ✓ মূল্য পরিবর্তনে পণ্যের বাজার বিভাগ চাহিদার সংবেদনশীলতা
- ✓ পণ্য মান, সেবা, ওয়ারেন্টি ইত্যাদি মূল্যহীন উপাদানের গুরুত্ব
- ✓ বিভিন্ন মূল্যস্তরের অনুমিত বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি।

খ) পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ: পণ্য মূল্য কৌশলের এ স্তরে পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণে যে উপাদানগুলো বিবেচনা করা আবশ্যক সেগুলো হলো-

- ✓ পণ্যের ব্যয় উপাদান
- ✓ ব্যয় প্রভাবের মাত্রা
- ✓ বিভিন্ন ব্যয়ের পরিমাণ
- ✓ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
- ✓ অভিজ্ঞতার অভাব
- ✓ ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

গ) প্রতিযোগী বিশ্লেষণ: মূল্য নির্ধারণ কৌশলে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত নিম্নের বিষয়গুলো জানার জন্য প্রতিযোগীার মূল্য কৌশল মূল্যায়ন করতে হয়:

- ✓ কাজের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা
- ✓ সকল প্রতিযোগীদের কৌশল কী
- ✓ প্রধান প্রতিযোগীর বিকল্প মূল্য কৌশল
- ✓ কীভাবে প্রতিযোগী মূল্য অবস্থান নিয়েছে ইত্যাদি।

ঘ) মূল্য কৌশল নির্বাচন: মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণে মূল্য কৌশল নির্বাচনের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। মূল্য নির্ধারণ পরিস্থিতির আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মূল্য কৌশল নির্বাচন করা যায়।

ঙ) ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ: ব্যয় ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে মূলত ব্যয়-কাঠামোর উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করতে হয়:

- ✓ মার্কআপ মূল্য নির্ধারণ বা ব্যয় যোগে মুনাফা মূল্য নির্ধারণ: এ পদ্ধতিতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে একটা নির্দিষ্ট হারে মুনাফা যোগ করে মার্কআপ মূল্য নির্ধারণ করা যায়।
- ✓ ভারসাম্য বিন্দু মূল্য নির্ধারণ: এ পদ্ধতিতে প্রথমে উৎপাদনের ভারসাম্য বিন্দু বা সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করতে হয়। ভারসাম্য বিন্দু হলো এমন একটি বিন্দু যেখানে পণ্য বিক্রয় ও খরচের পরিমাণ সমান হয়।

চ) প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ: চলমান হারে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে প্রতিযোগীরা কী পরিমাণ মুল্য ধার্য করে তার উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ছ) চাহিদাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ: পণ্যের চাহিদার উপর ভিত্তি করে যে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকে চাহিদাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ বলে। পণ্যের চাহিদা বেশি হলে বেশি মূল্য ধার্য করা হয়। পণ্যর চাহিদা কম হলো কম মূল্য ধার্য করা হয়।

৩. **১০৪মূল্য কৌশল নির্বাচন (Select pricing strategy):** মূল্য নির্ধারণ পরিস্থিতির আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মূল্য কৌশল নির্বাচন করা যায়। এসব তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবস্থাপনা নিম্নের বিষয়গলো জানতে পারে:

- ✓ মূল্যের নমনীয়তা
- ✓ ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে অবস্থান গ্রহণ কিভাবে করবে তা জানা যায়।

৪. **সুনির্দিষ্ট মূল্য ও পরিকল্পনা নির্ধারণ (Determine specific prices and policies):** এক্ষেত্রে কোম্পানি নিম্নের পদ্ধতি গুলোর মধ্যে থেকে যেকোন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ✓ খরচ যোগ করে মূল্য নির্ধারণ
- ✓ ভ্যালুভিত্তিক মূল্য-নির্ধারণ
- ✓ প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্য কৌশল অনুসরণ করা হয়।

মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ
Objectives of Pricing

মূল্য আমাদের জীবনকে ঘিরে আবর্তিত। কোনো পণ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য আমরা মূল্য প্রদান করি। মূল্যকে সাধারণত অর্থের আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি ব্যবসায় বা অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য, সেবা বা ধারণার জন্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়।

মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কোম্পানি কী অর্জন করতে চায় তা মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়। মূল্য নির্ধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান কী অর্জন করতে চায় সে সম্পর্কে বর্ণিত সাধারণ লক্ষ্যকে মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্য বলে। মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

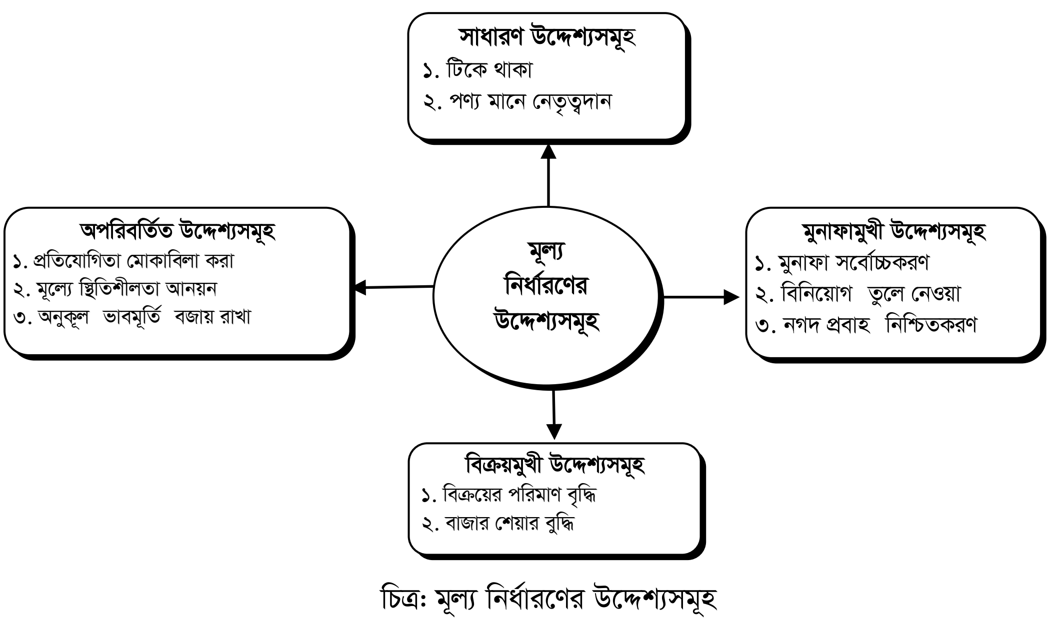

চিত্রঃ মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ (General objectives): মূল্য নির্ধারণের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **টিকে থাকা (Survival):** মূল্য নির্ধারণের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে টিকে থাকা। অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ভোক্তাদের পরিবর্তনশীল চাহিদার কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হলে কোম্পানি উদ্দেশ্য হিসেবে টিকে থাকাকে বেছে নেয়। আর টিকে থাকার জন্য কোম্পানি তার পণ্যের নিম্নমূল্য ধার্য করে থাকে।

২. **পণ্য মানে নেতৃত্বদান (Product quality leadership):** মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য হতে পারে পণ্য মানে নেতৃত্বদান। পণ্যের উচ্চমানের জন্য অত্যধিক খরচ হওয়ার কারণে কোম্পানি উচ্চমূল্য ধার্য করে থাকে। আবার উচ্চমূল্যকে ক্রেতারা উচ্চমানের প্রতীক মনে করে পণ্য ক্রয় করে থাকে। যেমন– মার্সিডিস বেঞ্জ মানেই উচ্চমান সম্পন্ন উচ্চমূল্যের গাড়ি।

(খ) মুনাফামুখী উদ্দেশ্যসমূহ (Profit objectives): মূল্য নির্ধারণের মুনাফামুখী উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit maximization):** মূল্য নির্ধারণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চ করা। এ উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চমূল্য ধার্য করে থাকে।

২. **বিনিয়োগ তুলে নেওয়া (Harvesting investment):** মূল্য নির্ধারণের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার থেকে দ্রুত বিনিয়োগ তুলে নেওয়া। পণ্যে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কোম্পানি জানতে পারে বিনিয়োগকৃত অর্থ কতদিনের মধ্যে ফেরত পাওয়া যাবে।

৩. **নগদ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ (Ensuring cash flows):** মূল্য নির্ধারণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করা। মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিটি পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া যাবে তা জানা যায়।

(গ) বিক্রয়মুখী উদ্দেশ্যসমূহ (Sales oriented objectives): মূল্য নির্ধারণের বিক্রয়মুখী উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (To increase sales):** মূল্য নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। পণ্যের মূল্য কম ধার্য করে বিক্রয় বৃদ্ধি করা যায়। সাধারণত স্বল্প সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য কম ধার্য করে থাকে। যেমন– রবি তাদের বিশেষ প্যাকেজের সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

২. **বাজার শেয়ার বৃদ্ধি (To increase market share):** মূল্য নির্ধারণের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করা। এজন্য কোম্পানি পণ্যের মূল্য কম ধার্য করে থাকে। কোম্পানি পূর্ণ বা অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে পণ্যের মূল্য কম ধার্য করতে পারে। যেমন– বাংলালিংক ব্যবসায়ের শুরু থেকেই তাদের মোবাইল ফোনের কলচার্জ সর্বনিম্ন ধার্য করে বাজার শেয়ার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

(ঘ) অপরিবর্তিত উদ্দেশ্যসমূহ (Unchange objectives): মূল্য নির্ধারণের অপরিবর্তিত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **প্রতিযোগিতা মোকাবিলা (To face competition):** মূল্য নির্ধারণের অপরিবর্তিত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা অন্যতম। সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম মূল্য নির্ধারণ করে সহজে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা যায়।

২. **মূল্য স্থিতিশীল রাখা (To keep price stability):** মূল্য নির্ধারণের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্য স্থিতিশীল রাখা। এজন্য কোম্পানি সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে স্থিতিশীল মূল্যনীতি অবলম্বন করে। মূল্য স্থিতিশীল হলে বা সহসা পরিবর্তিত না হলে ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৩. **অনুকূল ভাবমূর্তি বজায় রাখা (To establish positive image):** মূল্য নির্ধারণের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্রেতাদের অনুকূল ভাবমূর্তি সৃষ্টি ও বজায় রাখা। ক্রেতারা যদি সুলভ মূল্যে

উন্নত মানসম্পন্ন পণ্য নিয়মিত ক্রয় করতে পারে তাহলে ঐ পণ্য বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ক্রেতাদের মনে ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে এবং প্রতিনিয়ত পণ্য ক্রয় করবে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জিত হয়।

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি ব্যবসায় বা অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য, সেবা বা ধারণার জন্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়। মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কোম্পানি কী অর্জন করতে চায় তা মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে কতকগুলো স্তর বা ধাপ অনুসরণ করা হয়, যেমন- মূল্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, মূল্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, মূল্য কৌশল নির্বাচন, সুনির্দিষ্ট মূল্য ও পরিকল্পনা নির্ধারণ ইত্যাদি। কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল্য কৌশল অনুসরণ করা হয়। তবে পবির্তিত নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ কৌশলে ভিন্নতা দেখা যায়। ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় ক্ষমতা, পণ্যের চাহিদা, সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের উপস্থিতি, পণ্য সারি পরিমার্জন ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরণের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে। তাই মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ ৫.৪

মূল্য নির্ধারণের সাধারণ অ্যাপ্রোচ ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ General Approaches to Pricing and Factors Affecting Pricing Decision

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্য নির্ধারণের সাধারণ অ্যাপ্রোচ বা পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্য নির্ধারণের সাধারণ অ্যাপ্রোচ
General Approaches to Pricing

নিয়মিতভাবে মূল্য ধার্যের রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিকে মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বলে। কোম্পানি সাধারণত দুটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী যেকোনো স্থানে মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে থাকে। একটি হলো সর্বনিম্ন পর্যায়– যেখানে মুনাফা নেই এবং অপরটি হলো সর্বোচ্চ পর্যায়– যেখানে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক। এক্ষেত্রে কোম্পানি পণ্যের চাহিদাকে বিবেচনা করে থাকে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পণ্য উৎপাদন ব্যয়, পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের মনোভাব, প্রতিযোগীদের মূল্য ও কতকগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎপাদনকে বিবেচনা করে কোম্পানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। মূল্য নির্ধারণের সাধারণ পদ্ধতি নিচের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

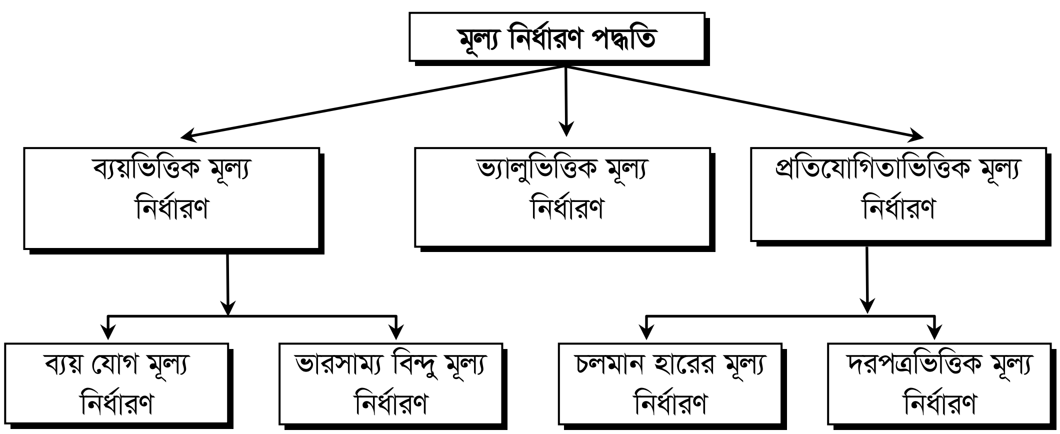

১. ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Cost Based Pricing): পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতিতে দুভাবে মূল্য নির্ধারণ করা যায়। যথা:

ক. **ব্যয়-যোগ/ মার্ক-আপ মূল্য নির্ধারণ (Markup/cost plus pricing):** এ পদ্ধতিটি মূল্য নির্ধারণের সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা যোগ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমন– কোনো একটি পণ্যের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১০.০০ টাকা এবং উৎপাদনকারী যদি পণ্যটি বিক্রয় করে ২.০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে চায় তবে পণ্যের মূল্য হবে (১০ + ২) = ১২.০০ টাকা। পেশাগত সংস্থা, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

ব্যয়-যোগ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণ বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমন–

ধরা যাক, কোম্পানির একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়	= ১০.০০ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয়	= ৩,০০,০০০.০০ টাকা

প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণ = ৫০,০০০ একক

$$\therefore \text{ একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় } = \text{পরিবর্তনশীল ব্যয়} + \frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{মোট বিক্রির পরিমাণ}}$$

$$= ১০ + \frac{৩,০০,০০০}{৫০,০০০}$$

$$= ১০ + ৬$$

$$= ১৬.০০$$

তাহলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হলো ১৬.০০ টাকা।

এখন কোম্পানি যদি ২০% লাভ করতে চায় তবে, এ পদ্ধতিতে একক প্রতি বিক্রয়মূল্য ধার্য করতে হবে–

$$\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য} = \frac{\text{একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়}}{১ - \text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার}}$$

$$= \frac{১৬}{১ - ২০\%}$$

$$= ২০.০০ \text{ টাকা।}$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ২০% মুনাফা অর্জন করতে চাইলে বিক্রয়মূল্য ধার্য করতে হবে ২০ টাকা। এক্ষেত্রে মুনাফা হবে (২০ − ১৬) = ৪.০০ টাকা।

খ. **ভারসাম্য বিন্দু মূল্য নির্ধারণ (Break-even point pricing):** ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের অপর একটি পদ্ধতি হলো ভারসাম্য বিন্দু মূল্য নির্ধারণ। এ পদ্ধতিতে প্রথমে ভারসাম্য বিন্দু (Break-even point) নির্ণয় করা হয় এবং তার ওপর প্রত্যাশিত হারে মুনাফা ধার্য করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ভারসাম্য বিন্দু হলো এমন একটি বিন্দু যে বিন্দুতে মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয়। ভারসাম্য মূল্য নির্ধারণকে টার্গেট মুনাফা মূল্য নির্ধারণ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণ কৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো–

মনে করি, কোনো পণ্যের–

একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ = ১০.০০ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয় = ৩,০০,০০০ টাকা
প্রত্যাশিত উৎপাদন/বিক্রয়ের পরিমাণ = ৫০,০০০ একক
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ = ১০,০০,০০০ টাকা এবং
বিক্রয়ের উপর প্রত্যাশিত টার্গেট/মুনাফা = ২০%

$$\therefore \text{ একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় } = \text{একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়} + \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ}}$$

$$= ১০ \text{ টাকা} + \frac{৩,০০,০০০ \text{ টাকা}}{৫০,০০০ \text{ একক}}$$

$$= ১০ \text{ টাকা} + ৬ \text{ টাকা}$$

$$= ১৬.০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য} = \text{একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়} + \frac{\text{প্রত্যাশিত মুনাফা} \times \text{বিনিয়োগকৃত মূলধন}}{\text{প্রত্যাশিত পরিমাণ}}$$

$$= ১৬ \text{ টাকা} + \frac{২০\% \times ১০,০০,০০০ \text{ টাকা}}{৫০,০০০ \text{ একক}}$$

= ১৬ টাকা + ৪ টাকা

= ২০.০০ টাকা।

$$\therefore \text{ ভারসাম্য বিন্দু (Break even) পরিমাণ} = \frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি বিক্রয় মূল্য} - \text{একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

$$= \frac{৩০০০০০}{২০ - ১০}$$

$$= \frac{৩০০০০০}{১০}$$

= ৩০,০০০ (একক)

তাহলে ভারসাম্য বিন্দুতে মোট আয় = একক প্রতি বিক্রয়মূল্য × ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ

= ২০ টাকা × ৩০,০০০

= ৬,০০,০০০.০০ টাকা।

অপরপক্ষে, ভারসাম্য বিন্দুতে মোট ব্যয় = মোট স্থায়ী ব্যয় + (একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় × ভারসাম্য পরিমাণ)

= ৩,০০,০০০ টাকা + (১০ × ৩০,০০০ টাকা)

= ৩,০০,০০০ টাকা + ৩,০০,০০০ টাকা

= ৬,০০,০০০.০০ টাকা।

উপরের উদাহরণটিকে ব্রেক ইভেন চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করলে আরও বেশি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

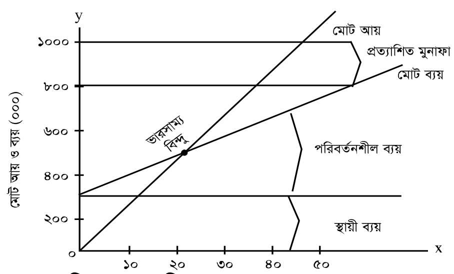

বিক্রয়ের পরিমাণ (০০০ একক)

চিত্র: ব্রেক ইভেন চার্ট

Source: Philip Kotler & Gary Armstrong, Principles of Marketing, 13th edn 2010, p-298

চিত্র হতে দেখা যাচ্ছে, ২০ টাকা মূল্যে কোম্পানি যখন ৩০,০০০ একক পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে তখন মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান (৬,০০,০০০ টাকা) হবে। অর্থাৎ লাভও হবে না লোকসানও হবে না। এ বিন্দুকে বলা হয় ভারসাম্য বিন্দু (BEP). কোম্পানি যদি বিনিয়োগের ওপর ২০% লাভ করতে চায় তাহলে তাকে একক প্রতি ২০ টাকা দরে ৫০,০০০ একক বা (২০ × ৫০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করতে হবে, যেখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৮,০০,০০০ টাকা (চিত্রানুসারে)। অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু বা সমচ্ছেদ বিন্দুর চেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লাভ হবে এবং কম বিক্রয় হলে লোকসান হবে।

২. **ভ্যালুভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Value Based Pricing):** যে পদ্ধতিতে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে পণ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকে ভ্যালুভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ক্রেতার মনোভাব কেমন তার ওপর ভিত্তি করে পণ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যদি ক্রেতার মনোভাব উচ্চ হয় তবে পণ্য মূল্য বেশি এবং বিপরীত হলে পণ্য মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়। যেমন– টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, জেলার নিউ মার্কেটে ১,৫০০ টাকা অথচ একই মানসম্পন্ন শাড়ি ঢাকার বেইলি রোডে ৩,০০০ টাকা। এখানে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. **প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Competition Based Pricing):** প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. চলমান হারে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Going-rate Pricing): এ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রতিযোগীদের মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার পণ্যের নিজস্ব খরচ কিংবা চাহিদার দিকে খুব কম মনোযোগ দেওয়া প্রতিষ্ঠান তার মুখ্য প্রতিযোগীদের কর্তৃক অনুসৃত মূল্যের সমান, অধিক কিংবা কমে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারে। সাধারণত যে সব ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা কঠিন সেখানে এ পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কারণ সেখানে মনে করা হয় যে, এ পদ্ধতি শিল্পের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে।

খ. সিলমোহরকৃত নিলামের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Sealed Based Pricing): এ পদ্ধতি প্রধানত ঠিকাদারী কাজে অনুসৃত হয়ে থাকে। সরকারি কাজের চুক্তিগুলো সচরাচর টেন্ডার পদ্ধতিতে সম্পাদন হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্যসম্পাদনের সম্ভাব্য মোট খরচ পূর্বে হিসাব করা হয়। যে প্রতিযোগী নিম্নতম মূল্যের প্রস্তাব দেয় সে মূল্যটি গৃহীত হয় এবং ঐ প্রতিযোগীকেই সচরাচর ঠিকাদারি কাজটি প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলোর আওতায় কেবল চলমান বাজার দরের প্রেক্ষিতেই পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে –

ক. প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়

খ. প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ের নিচে এবং

গ. প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ের অধিক এ তিন পর্যায়ে মূল্য নির্ধারিত হতে পারে।

৩. **ক্রেতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Customer Based Pricing):** আজকাল অনেক কোম্পানিই তাদের পণ্যের জন্য উপলব্ধিকৃত মূল্যায়ন ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। তারা মূল্য নির্ধারণের চাবিকাঠি হিসেবে বিক্রেতার খরচ বিবেচনা না করে সংশ্লিষ্ট পণ্যকে ক্রেতা কী পরিমাণে মূল্য দেয় তাই বিবেচনা করা হয়। বিক্রেতারা ক্রেতার মনে এরূপ উপলব্ধিকৃত মূল্য সৃষ্টির জন্য বিপণন মিশ্রণের অন্তর্গত মূল্য বহির্ভূত উপাদান বা চলকসমূহ ব্যবহার করে। উক্ত Perceived value-টি দখল করার জন্যই মূলত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় সমজাতীয় দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দাম আদায় করা।

৪. **চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Demand and Supply Pricing):** এ পদ্ধতিতে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম মূল্য নির্ধারণ করার জন্য পণ্যের চাহিদা ও খরচের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং যেসব কোম্পানি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে চায় তাদের জন্য এ পদ্ধতি সর্বোত্তম। তবে মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনাকরণের জন্য অন্যান্য কোম্পানিসমূহকেও এ পদ্ধতি অবগত হওয়া আবশ্যক। তবে এখানে চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় একজন বিক্রেতার চাহিদা রেখাসূচি ও সমগ্র শিল্পের চাহিদা রেখা বা সূচির মধ্যে পার্থক্য টানতে হবে।

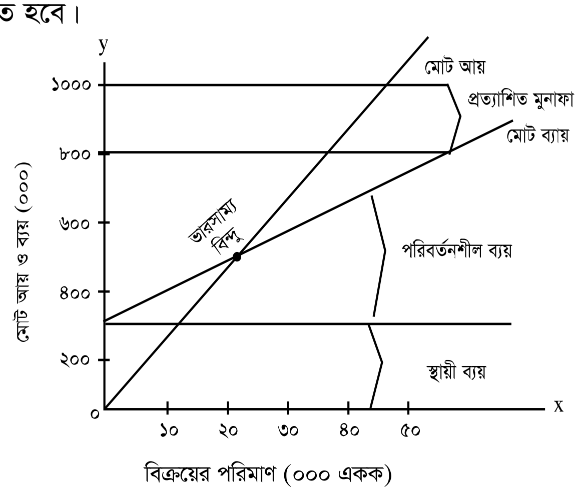

চিত্র: ব্রেক ইভেন চার্ট

Source: Philip Kotler & Gary Armstrong, Principles of Marketing, 13th edn 2010, p-298

চিত্র হতে দেখা যাচ্ছে, ২০.০০ টাকা মূল্যে কোম্পানি যখন ৩০,০০০ একক পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে তখন মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান (৬,০০,০০০.০০ টাকা) হবে। অর্থাৎ লাভও হবে না লোকসানও হবে না। এ বিন্দুকে বলা হয় ভারসাম্য বিন্দু (BEP). কোম্পানি যদি বিনিয়োগের উপর ২০% লাভ করতে চায় তাহলে তাকে একক প্রতি ২০.০০ টাকা দরে ৫০,০০০ একক বা (২০ × ৫০,০০০) = ১০,০০,০০০.০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করতে হবে, যেখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৮,০০,০০০.০০ টাকা (চিত্রানুসারে)। অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু বা সমচ্ছেদ বিন্দুর চেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লাভ হবে এবং কম বিক্রয় হলে ক্ষতি হবে ।

মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
Factors Affecting Pricing Decision

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ একটি জটিল কাজ। প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্ধারণ বহু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

(ক) মূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ (Internal Factors Affecting Pricing Decision):

১. **বিপণন উদ্দেশ্যাবলি (Marketing objectives):** প্রতিষ্ঠানের বিপণন উদ্দেশ্যাবলি পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্তকে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে। সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্ধারণ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

- **টিকে থাকা (Survival):** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা। আর তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অনেক সময় কোম্পানি প্রতিযোগীর চেয়ে কম মূল্য ধার্য করে থাকে। অবশ্য এটি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য করা হয়।
- **চলতি মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximization):** বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম থাকলে কোম্পানি অনেক সময় পণ্যের উচ্চমূল্য ধার্য করে চলতি মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে থাকে।
- **বাজার শেয়ার সর্বোচ্চকরণ (Market Share Maximization):** প্রতিযোগিতা তীব্র হলে অনেক সময় বাজার শেয়ার সর্বোচ্চকরণের জন্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ধার্য করে থাকে।
- **বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (Increasing Sales Volume):** বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক সময় পণ্যের মূল্য কম ধার্য করা হয়।
- **বিনিয়োগ তুলে নেওয়া (Harvasting Investment):** স্বল্প সময়ে বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সময় কোম্পানি পণ্যের মূল্য বেশি ধার্য করতে পারে।
- **গুণগত মানে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা (Maintaining Quality Leadership):** এক্ষেত্রে গুণগত মানের পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উচ্চ বিক্রয়মূল্য ধার্য করতে হয়।
- **অন্যান্য উদ্দেশ্য (Other Objectives):** মূল্য নির্ধারণের আরও অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন–
  - ✓ প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করা
  - ✓ প্রতিযোগীদের গ্রাহক ছিনিয়ে নেওয়া
  - ✓ ভোক্তাদের আনুগত্য সৃষ্টি ও তা ধরে রাখা ইত্যাদি।

২. **বিপণন মিশ্রণ কৌশল (Marketing mix strategy):** মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপণন মিশ্রণের আরও বেশকিছু

উপাদান অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কারণ এ উপাদানগুলো মূল্য নির্ধারণে সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন– সঠিক পণ্য, সঠিক স্থানে পৌঁছানো এবং পণ্য সম্পর্কে ভোক্তাদেরকে জানাতে হলে পণ্যের মূল্য বেশি হবে। কিন্তু প্রসার ও বণ্টনকার্য না করলে পণ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত কম হবে।

৩. **ব্যয়সমূহ (Costs):** মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যয় দুই প্রকার। যথা : স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়। কোম্পানি সাধারণত স্থায়ী ব্যয়ের সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় এবং তার প্রেক্ষিতে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

i. **উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয় (Costs at different stages of production)**: উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে পণ্যের একক প্রতি উৎপাদন খরচ কম বা বেশি হয়ে থাকে। যেমন– উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ কম এবং উৎপাদনের পরিমাণ কম হলে একক প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। কাজেই পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যটি উৎপাদনের কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় কেমন হচ্ছে তা বিবেচনা করতে হবে।

ii. **উৎপাদন অভিজ্ঞতার চলক হিসেবে ব্যয় (Costs as a function of production experience)**: উৎপাদন ব্যয়ের উপর উৎপাদন কর্মীর কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে যার যত বেশি অভিজ্ঞতা থাকে, তার উৎপাদন ব্যয় তত কম হয়। আর উৎপাদন ব্যয় কম হলে কোম্পানি তুলনামূলকভাবে কম মূল্য ধার্য করতে পারে। কাজেই পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মীও কর্মদক্ষতা এবং কোম্পানির অভিজ্ঞতার মতো চলককেও বিবেচনা করতে হবে।

৪. **সাংগঠনিক বিবেচনাসমূহ (Organizational consideration):** মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে বিবেচনা করতে হবে, কে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে। সাধারণত ছোট ফার্মের ক্ষেত্রে উচ্চ নির্বাহীরা, বড় বড় ফার্মের ক্ষেত্রে বিপণন বিভাগের নির্বাহীগণ এবং শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় বিক্রয় কর্মীদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক একটি বিভাগই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যেমন– বিমান, রেলওয়ে, গ্যাস ও তেল কোম্পানি। আবার কোনো কোনো কোম্পানির বিক্রয় ব্যবস্থাপক, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, অর্থ ব্যবস্থাপক এবং হিসাব ব্যবস্থাপকগণ সম্মিলিতভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(খ) মূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী বাহ্যিক উপাদানসমূহ (External Factor affacting Pricing Decision): বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদান মূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. **বাজার ও চাহিদা (Market and Demand):** খরচ মূল্যের নিম্নসীমাকে এবং বাজার ও চাহিদা মূল্যের উচ্চসীমাকে নির্দেশ করে। ক্রেতা পণ্য বা সেবা থেকে প্রাপ্ত সুবিধার আলোকে মূল্যকে বিবেচনা করে থাকে। কাজেই ভোগ্যপণ্য বা শিল্পপণ্য উভয় ক্ষেত্রেই মূল্য নির্ধারণে বাজার ও চাহিদাকে বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে যা বিবেচনা করতে হবে তা হলো:

i. **বিভিন্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ (Pricing in different types of market):** বাজারের ধরন বিবেচনা করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমন–

ক. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Pure competition markets):** এ ধরনের বাজার ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকে এবং সমজাতীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে বিক্রেতারা পণ্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

খ. **একচেটিয়া প্রতিযোগিতমূলক বাজার (Monopolistic competition):** এ জাতীয় বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং বিক্রেতা অন্যান্য প্রতিযোগীর বাজার কৌশল বিবেচনা করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে

থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানি তার প্রতিযোগী কোম্পানির পণ্য থেকে রং, সাইজ, মোড়ক এবং গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য ও প্রদত্ত সেবা পৃথকীকরণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে থাকে।

গ. **অলিগোপালি বাজার (Oligopolistic competition):** এ ধরনের বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে এবং তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মূল্যনীতি অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিযোগীদের মূল্যের প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং প্রতিযোগীদের কৌশল বিবেচনা করে মূল্য কৌশল সমন্বয় করে থাকে।

ঘ. **পূর্ণ একচেটিয়া বাজার (Pure monopoly market):** এ জাতীয় বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে। বিক্রেতা তার ইচ্ছানুযায়ী যে মূল্য নির্ধারণ করে, ক্রেতারা তা দিতে বাধ্য থাকে।

ii. **মূল্য ও ভ্যালু সম্পর্কে ক্রেতার অনুভূতি (Consumer perceptions of price and value):** পণ্যের ভ্যালুর তুলনায় মূল্যকে ভোক্তারা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে তা বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যটি বেশি ভ্যালু সম্পন্ন মনে করলে ক্রেতারা বেশি মূল্য দিতে রাজি থাকে।

iii. **মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ (Analysing the price and relationships):** পণ্যের মূল্যের সাথে চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক আছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সাধারণত মূল্য কমে গেলে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং মূল্য বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যায়। মূল্য ও চাহিদার ক্রিয়াগত এ সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। চাহিদা বিধিকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদা রেখা বলে। নিচে চিত্রের সাহায্যে চাহিদা রেখা দেখানো হলো :

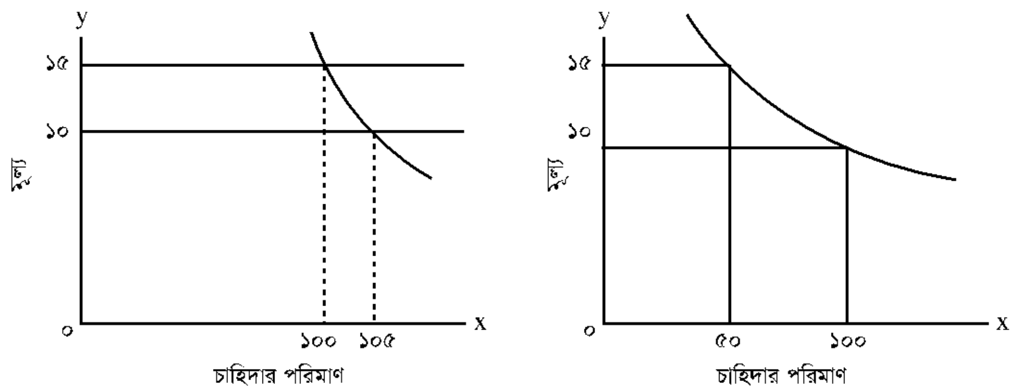

(ক) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা *(খ) স্থিতিস্থাপক চাহিদা*

উপরের চিত্র ‘ক’-তে দেখা যাচ্ছে, মূল্য যে হারে কমেছে, চাহিদা সে হারে বাড়েনি। আবার চিত্র ‘খ’-তে দেখা যায়, দাম যে হারে কমেছে চাহিদা তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। কাজেই বিপণনকারী পণ্যের এসব স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদাকে বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

iv. **চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা (Price elasticity of demand):** মূল্যের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বলে।

অর্থাৎ–

$$\text{চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার}}{\text{মূল্যের শতকরা পরিবর্তনের হার}}$$

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পণ্যের মূল্য ১০% কমায় যদি বিক্রির পরিমাণ ২০% বৃদ্ধি পায় তবে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপক হবে ০.২০ অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু মূল্যের পরিবর্তন ২% বৃদ্ধিতে বিক্রির পরিমাণ ২% কমে যায় তাহলে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপক হবে ১ এবং এক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

আবার মূল্য ২% বৃদ্ধিতে চাহিদার পরিমাণ ১% কমে গেলে মূল্য স্থিতিস্থাপক হবে ০.৫০ অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ হয়।

কাজেই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতাকে বিবেচনা করতে হবে।

২. **প্রতিযোগীদের পণ্যের মূল্য ও প্রদত্ত সুবিধা (Competitors costs, price and efforts):** একজন ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করে তখন অন্যান্য কোম্পানির সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের মূল্য এবং তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও অর্পণের সাথে তুলনা করে থাকে। কাজেই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের পণ্যের মূল্য ও প্রদত্ত সুবিধাকে বিবেচনা করতে হবে।

৩. **অন্যান্য বাহ্যিক উপাদান (Other external factors):** মূল্য নির্ধারণের সময়ে কোম্পানিকে পরিবেশের বাহ্যিক কতকগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। উপাদানগুলো হলো:

- **অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic conditions):** দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকলে মূল্য বেশি নির্ধারণ করলেও মানুষ পণ্য ক্রয় করে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে মূল্য কম হলেও মানুষ কম পণ্য ক্রয় করে।
- **পুনঃবিক্রেতার প্রতিক্রিয়া (Resellers reactions):** মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুণঃবিক্রেতাকে প্রদত্ত কমিশন বা সুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়।
- **সরকার (Government):** মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারি আইনকানুন ও প্রভাবকে বিবেচনা করতে হবে।
- **সামাজিক বিষয় (Social concerns):** সামাজিক বিভিন্ন বিষয়কে মূল্য নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হবে। কারণ এর দ্বারা পণ্যের বিক্রয়, বাজার শেয়ার এবং মুনাফার পরিমাণ প্রভাবিত হয়।

সারসংক্ষেপ

নিয়মিতভাবে মূল্য ধার্যের রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিকে মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বলে। কোম্পানি সাধারণত দুটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী যেকোনো স্থানে মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে থাকে। একটি হলো সর্বনিম্ন পর্যায়– যেখানে মুনাফা নেই এবং অপরটি হলো সর্বোচ্চ পর্যায়– যেখানে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক। এক্ষেত্রে কোম্পানি পণ্যের চাহিদাকে বিবেচনা করে থাকে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পণ্য উৎপাদন ব্যয়, পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের মনোভাব, প্রতিযোগীদের মূল্য ও কতকগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎপাদনকে বিবেচনা করে কোম্পানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল্য কৌশল অনুসরণ করা হয়। তবে পবির্তিত নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ কৌশলে ভিন্নতা দেখা যায়। ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় ক্ষমতা, পণ্যের চাহিদা, সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্যের উপস্থিতি, পণ্য সারি পরিমার্জন ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরণের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে।

পাঠ-৫.৫

মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ
Price Adjustment Strategies

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন

মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ

Price Adjustment Strategies

তীব্র প্রতিযোগিতা ও ক্রেতাদের মূল্য বিষয়ক সংবেদনশীলতার কারণে কোম্পানিকে প্রায়শই তাদের প্রকৃত মূল্যকে সমন্বয় সাধন করতে হয়। নিচে মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **বাট্টা এবং ছাড় (Discounts and allowances pricing):** অনেক সময় ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোম্পানি তাদের পণ্যের মূল্যে সমন্বয় সাধন করে। অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় এমনকি ক্রেতাদেরকে বার বার ক্রয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য কোম্পানি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে পুরস্কৃত করার প্রচেষ্টা চালায়। বাট্টা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন-

- নগদ বাট্টা (Cash discount): দ্রুত অর্থ পরিশোধে প্রনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি এ ধরনের বাট্টা প্রদান করে থাকে। যেমন: ক্রেতাকে ৩০ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধের সময় দেয়া হলো কিন্তু ক্রেতা যদি ১০ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তবে তাকে ২% বাট্টা প্রদান করা হবে।

- পরিমাণগত বাট্টা (Quantity discount): ক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্রেতাকে যে বাট্টা প্রদান করা হয় তাকে পরিমাণগত বাট্টা বলে। অর্থাৎ বেশি পরিমাণে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি এরূপ কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যেমন: একই সাথে ৫০০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করলে ৫% বাট্টা প্রদান করা হবে।

- কার্যভিত্তিক বাট্টা (Functional discount): বণ্টন প্রণালির সদস্যদের কার্যাবলি মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাইকার ও খুচরা বিকেতাকে যে বাট্টা প্রদান করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক বাট্টা বলে। যেমন: তালিকা মূল্যে উল্লিখিত বিক্রয়ের ভিত্তিতে ২০% বাট্টা প্রদান করা হবে।

- মৌসুমি বাট্টা (Seasonal discount): অ-মৌসুমে অথবা অফ-সিজনে পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে যে বাট্টা দেয়া হয় তাকে মৌসুমি বাট্টা বলে। যেমন: গ্রীষ্মকালে কক্সবাজারের হোটেলগুলো গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছাড় বা বাট্টার অফার করে থাকে।

২. **বিভক্ত মূল্য নির্ধারণ (Segmented Pricing):** ক্রেতাদের জীবন ধাঁচ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পণ্যমান, অবস্থান, সময় ইত্যাদির ভিত্তিতে অনেকসময় কোম্পানিগুলো বিভিন্নরকম পণ্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। নিম্নোক্ত উপায়ে বিভক্ত মূল্য নির্ধারণ হতে পারে:

- ক্রেতা বিভাগভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (customer segment pricing): এ কৌশলে একই পণ্য বিভিন্ন ক্রেতাদের নিকট বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বিনোদন পার্কে ছাত্র/ছাত্রীদের হাফ টিকিট প্রদান।

- পণ্যের ধরনভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Product form pricing): এ কৌশলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন আকৃতির পণ্য তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

- অবস্থানভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Location pricing): এ কৌশলে ক্রেতাদের অবস্থানভেদে একই পণ্যের আলাদা-আলাদা মূল্য ধার্য করা হয়।

- সময়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Time pricing): এ কৌশলে সময়ভিত্তিক (অর্থাৎ সময়ভেদে) একই পণ্যের ভিস্‌স ভিস্‌স মূল্য ধার্য করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো কেতা আর্কষণের জন্য রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কম মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ (Pasychological pricing):** ক্রেতাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হলে তাকে মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ বলে। মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ নিম্নোক্তভাবে হতে পারে। যথা:

- প্রেস্টিজ মূল্য নির্ধারণ (Prestige pricing): অনেক সময় কোম্পানি তার প্রেস্টিজ বা ভাবমূর্তি প্রকাশ করার লক্ষ্যে পণ্যের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যেমন: OTOBI এর ফার্নিচার যার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।
- বিজোড়-জোড় মূল্য নির্ধারণ (Odd-even pricing): এ কৌশলে কোম্পানি জোড় সংখ্যার পরিবর্তে বিজোড় সংখ্যারমাধ্যমে পণ্যের মূল্যে পার্থক্য আনয়ন করে ক্রেতাদেরকে মানসিকভাবে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। যেমন: বাটা কোম্পানি তাদের জুতার দাম ৮০০ টাকা না ধার্য করে ৭৯৯ টাকা ধার্য করে।
- রেফারেন্স মূল্য নির্ধারণ (Reference pricing): পণ্যের যে মূল্য ক্রেতার মনের মধ্যে ধারণ করা অথবা পণ্য দেখা মাত্রই উক্ত পণ্যের মূল্য স্মরণে আসে তাকে রেফারেন্স মূল্য বলে।

৪. **প্রসারমূলক মূল্য নির্ধারণ (Promotional pricing):** এ কৌশলে স্বল্পমেয়াদে বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। প্রসারমূলক ম্যূণ্য নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো নিম্বরূপ:

- বাট্টা (Discounts): বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি কখনো কখনো পণ্যের স্বাভাবিক মূল্যের উপর কিছু বাট্টা বা ছাড় প্রদান করে। যেমন: ১০০০ টাকার পণ্য কিনলে ২% বাট্টা দেয়া হবে।
- বিশেষ ঘটনাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (Special-event pricing): এ কৌশলে বিশেষ কোন ঘটনা, উৎসব বা পর্বকে কেন্দ্র করে অধিক বিক্রয়ের লক্ষ্যে পণ্যের মূল্য হ্রাস করা হয়। যেমন: বিভিন্ন উৎসব তথা-ঈদ, পূজা, বাণিজ্য মেলা, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোম্পানি তাদের বিভিন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাস করে থাকে।
- নগদ মূল্যছাড় (Cash rebates): এরূপ কৌশলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য কিনলে, ক্রেতাকে নগদ ছাড় দেয়া হয়।

৫. **ভৌগোলিক মূল্য নির্ধারণ (Geographical pricing):** এক্ষেত্রে কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতাদের নিকট একই দামে পণ্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা চালায়। ভৌগোলিক মূল্য নির্ধারণ নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে। যথা:

- এফ. ও. বি. উৎস মূল্য নির্ধারণ (FOB orgin pricing): এ কৌশলে বিক্রেতা তার ফ্যাক্টরি থেকে সকল ক্রেতার নিকট একই মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে এবং ক্রেতারা পরিবহন খরচ বহন করে।
- সমরূপ সরবরাহ মূল্য নির্ধারণ (Uniform delivered pricing): পরিবহন ব্যয় বা ক্রেতাদের অবস্থান বিবেচনা না করে সকল ক্রেতার জন্য একই রকম মূল্য নির্ধারণ কৌশলকে বলে সমরূপ সরবরাহ মূল্য নির্ধারণ। যেমন: আমাদের দেশের যে প্রান্তেই চিঠি পাঠানো হোক না কেন সেক্ষেত্রে ৩ টাকা মূল্যের টিকিট সংযোজন করতে হবে।
- আঞ্চলিক মূল্য নির্ধারণ (Zone pricing): এ কৌশলে বিক্রেতা তার বাজারকে ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি এলাকার জন্র আলাদা-আলাদা মূল্য ধার্য করে।

- ভিত্তি-বিন্দু মূল্য নির্ধারণ (Basing point pricing): এক্ষেত্রে বিক্রেতা এক বা একাধিক স্থান বা শহরকে ভিত্তি-বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে ঐ ভিত্তি স্থান বা শহরের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।
- ভাড়া-শোষণ মূল্য নির্ধারণ (Freight absorption pricing): এ কৌশলে বিক্রেতারা প্রত্যাশিত সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাহাজভাড়া সমন্বয় করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ক্রেতাদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাজারজাতকারীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

বাট্টা ও রিবেট

Discount and Rebates

কোম্পানি অনেক সময় বিক্রয় বৃদ্ধি ও বাজার শেয়ার ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশল গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম কার্যকরী কৌশল হলো:

ক. বাট্টা (Discounts) এবং

খ. মূল্য ছাড় (Rebates)।

নিচে এ দুটি কৌশল বর্ণনা করা হলো:

(ক) বাট্টাসমূহ (Discounts): দ্রুত মূল্য পরিশোধ পণ্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এক মৌসুমের পণ্য অন্য মৌসুমে বিক্রয়, ক্লিয়ারেন্স সেলস্ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক কোম্পানি তাদেরকে ক্রেতাদেরকে ধরে রাখার জন্য নানা প্রকার 'মূল্য প্রণোদনা' দিয়ে থাকে। এ ধরনের মূল্য সমন্বয়কে বাট্টা বলে। বাট্টা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–

(i) নগদ বাট্টা (Cash discount): নগদ পণ্য বিক্রয়ের সময় যে সকল ক্রেতা দ্রুত মূল্য পরিশোধ করে তাদেরকে যে 'মূল্য ছাড়' দেওয়া হয় তাকে নগদ বাট্টা বলে। যেমন– '৩/৩০ নিট ৯০' লেখা থাকলে বোঝা যাবে ৩০ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে ৩% বাট্টা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বাকির সময় ৯০ দিন থাকলেও ক্রেতা যেন ৩০ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় সেজন্য ৩০% ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(ii) পরিমাণগত বাট্টা (Quantity discount): বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি এ ধরনের বাট্টা প্রদান করে থাকে। ক্রেতাদেরকে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ বাট্টা প্রদান করা হয়। যেমন– ২০,০০০.০০ টাকার পণ্য কিনলে ১০% ছাড় কিন্তু ৫০,০০০.০০ টাকার পণ্য কিনলে ২০% ছাড় দেওয়ার ঘোষণা প্রদান। অথবা তিন কেইস পেপসি একত্রে কিনলে তিন বোতল পেপসি ফ্রি প্রদান।

(iii) মৌসুমি বাট্টা (Seasonal discount): ব্যবসায়ের অফ্‌সিজন বা মন্দা মৌসুমে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি বা ধরে রাখার জন্য এ ধরনের বাট্টা প্রদান করা হয়। সাধারণত সেবা খাতে এ ধরনের বাট্টা প্রদান বিক্রয় বৃদ্ধিতে বেশি সহায়তা করতে পারে। যেমন– হোটেল, মোটেল, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি সেবাকার্য, মন্দা মৌসুমে এ বাট্টা প্রদান করতে পারে। যেমন– কক্সবাজারের বিভিন্ন হোটেলগুলো অফ্‌সিজনে সিট ভাড়া ২০% কমাতে পারে।

(iv) সুবিধাদি (Allowances): মূল্য তালিকা থেকে যে পরিমাণ ছাড় দেওয়া হয় তাকে সুবিধা প্রদান (Allowances) বলে। সাধারণত দুই ধরনের মূল্য ছাড় প্রদান করা হয়। যেমন–

- **ট্রেড ইন এ্যালাউন্স (Trade-in-allowances):** পুরনো পণ্যের স্টক ক্লিয়ার করার জন্য যে মূল্য ছাড় দেওয়া হয় তাকে ট্রেড ইন এ্যালাউন্স বলে। যেমন– বাটা সু কোম্পানি ৭০% পর্যন্ত ছাড় দিয়ে থাকে।
- **প্রসারমূলক ছাড় (Promotional allowances):** ডিলারকে বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সমর্থন কার্যের অংশগ্রহণের জন্য তালিকা মূল্য হতে যে নগদ অর্থ ছাড় দেওয়া হয় তাকে প্রসারমূলক ছাড় বলে।

(খ) **মূল্য ছাড় (Cash Rebates):** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পণ্য কিনলে যদি কিছু নগদ ছাড় দেওয়া হয় তবে তাকে Cash Rebates বলে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের ছাড় দেওয়া হয়। বর্তমানে ফ্ল্যাট বিক্রয়, গাড়ি ও গৃহস্থালি পণ্যে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সারসংক্ষেপ

অনেক সময় ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোম্পানি তাদের পণ্যের মূল্যে সমন্বয় সাধন করে। দ্রুত মূল্য পরিশোধ পণ্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এক মৌসুমের পণ্য অন্য মৌসুমে বিক্রয়, ক্লিয়ারেন্স সেলস্ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক কোম্পানি তাদেরকে ক্রেতাদেরকে ধরে রাখার জন্য নানা প্রকার 'মূল্য প্রণোদনা' দিয়ে থাকে। এ ধরনের মূল্য সমন্বয়কে বাট্টা বলে। ক্রেতাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হলে তাকে মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ বলে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পণ্য কিনলে যদি কিছু নগদ ছাড় দেওয়া হয় তবে তাকে Cash Rebates বলে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের ছাড় দেওয়া হয়। বর্তমানে ফ্ল্যাট বিক্রয়, গাড়ি ও গৃহস্থালি পণ্যে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. মূল্য বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লিখুন।
২. মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. মূল্য নির্ধারণ কৌশল বর্ণনা করুন।
৪. মূল্যের কৌশলগত ভূমিকায় সম্পৃক্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করুন।
৫. মূল্য নির্ধারণের সাধারণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
৬. মূল্য কৌশল নির্ধারণের পন্থাসমূহ বর্ণনা করুন।
৭. মূল্য সমন্বয় কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

তথ্যসূত্র:

Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing (16th Edition). Pearson Education.

Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (1996). Basic marketing: a global-managerial approach. Irwin.

Cravens, D. W., & Piercy, N. F. (2008). Strategic Marketing (9th Edition). McGraw-Hill Education, Irwin.

Xavier Vives (1999). Oligopoly Pricing: Old Ideas and New tools. Penguin Random House LLC.